গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৮ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ এপ্রিল ২০২৬ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সাম্প্রদায়িক বিজেপি, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাস্ত করুন

সংগ্রামী বামপন্থী এসইউসিআই(সি) প্রার্থীদের জয়ী করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, এ বারের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন এক বেনজির আবহে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এক দিকে, তৃণমূল শাসিত রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে জনমানসে প্রবল ক্ষোভ। অন্য দিকে, তার সুযোগ নিয়ে কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন জনসাধারণের রক্ত জল করা ট্যাক্সের টাকায় লালিত-পালিত হয়েও জনসাধারণের বিরুদ্ধেই যেন এক নাগাড়ে যুদ্ধ করে চলেছে। স্বৈরাচার ছাড়া আর কোন নামে একে অভিহিত করা যায়? প্রথমে ৫৮ লক্ষাধিক, পরে আরও ৫ লক্ষাধিক, তারপরে 'লজিক্যাল ডিস্ক্রিপ্রেন্সি'-র নামে ২৭ লক্ষাধিক মানুষের নাম বাতিল করেছে। বাতিল হওয়া মানুষকে বলা হচ্ছে ট্রাইবুনালে যেতে। কিন্তু কোথায় সে ট্রাইবুনাল, কবে তার কাজ শেষ হবে। কোনও কিছু নিশ্চিত নয়। ফলে, এই বিরাট সংখ্যক মানুষের ভোটাধিকার থাকছে না। আশ্চর্যের কথা, তালিকা থেকে বাদ দেওয়া মানুষকে বলা হচ্ছে, এ বারে না থাকলেও পরে ভোটাধিকার

দুয়ের পাতায় দেখুন

'বঞ্চিত বৈধ ভোটার মঞ্চ'-এর পক্ষ থেকে ১০ এপ্রিল ঝাড়গ্রাম ডিএম দপ্তরে ডেপুটেশন

বাতিল বৈধ ভোটারদের ট্রাইবুনালে সাহায্যের জন্য কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চের হেল্প ডেস্ক

বিধানসভা নির্বাচনে

২৩০টি কেন্দ্রে

এসইউসিআই

(কমিউনিস্ট)

প্রার্থীদের

টর্চ চিহ্নে ভোট দিয়ে

জয়ী করুন

অনুপ্রবেশ ঃ স্বরাষ্ট্র দপ্তরের তথ্যই মানছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঘুসপেটিয়া বা অনুপ্রবেশকারী শব্দটি বিজেপি সরকারের নেতা-মন্ত্রী বিশেষ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বড়ই প্রিয়। দেশের বুকে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে এই শব্দবন্ধটি তিনি বারবার উত্থাপন করে চলেছেন। এমনকি অতীতে এ কথাও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দু'কোটি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী আছে। অমিত শাহের ঘোষণা, বিজেপির 'মহৎ' কাজ হল রাজ্য থেকে এই সব অনুপ্রবেশকারীদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করা।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের সামনে তিনি আবার সেই পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটেছেন এবং বলেছেন, বিজেপি চায় বাংলাকে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত করতে। ভেবেছেন, এতে মানুষের সমর্থন তাঁদের দিকে আসবে। ব্যালট বাক্স ভোটে পূর্ণ হয়ে যাবে।

খুব ভাল কথা। কেউ চায় না রাজ্যটা অনুপ্রবেশকারীতে ভরে যাক। সবাই চায় অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দপ্তর এক এক করে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারী ধরুক, তাদের আদালতে বিচার করুক এবং তাদের সবাইকে নির্দিষ্ট দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুক। কিন্তু আমরা কী দেখছি? পুশ ব্যাক করার নামে তাঁরা বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের নির্বাচনে বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে তাঁদের ধরে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছেন, আসামে বাংলাভাষীদের সীমান্ত এলাকার জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন। অসহনীয় নির্যাতন সহ্য করে বাংলাদেশের কোর্টে আবেদন করে তাঁরা যে ভারতীয় এটা প্রমাণ করে আবার তাঁদের দেশে ফিরতে হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর বিজেপির নেতৃত্বে হামলা চলছে এবং এমনকি দিল্লি এবং হরিয়ানায় বাঙালি কলোনির উপর বিজেপি সরকারের মদতে হামলা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর যে মারাত্মক আক্রমণ চলছে সে কথা সবাই জানে। এই সব বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর আক্রমণ চালিয়ে বিজেপি দেখাতে চায় দেশটা অনুপ্রবেশকারীতে ভরে গেছে— এটাই বিজেপির অ্যাজেন্ডা।

অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার প্রশ্নে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কতটা আন্তরিক, এ বার সেই আলোচনায় আসা যাক। গত ২০১৯ সালে অমিত শাহ হুঙ্কার ছেড়ে বলেছিলেন, বাংলায় দু'কোটি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী আছে। কোথা থেকে এই হিসেব তিনি পেলেন, তা তিনিই বলতে পারবেন। ওঁরা সত্যের ধার ধারেন না, তথ্যসূত্র দেওয়ারও প্রয়োজনবোধ করেন না। মিথ্যা কথা বারবার বলেন, জোরের সাথে বলেন এবং এই ভাবে মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করতে চান। ঠিক যেমন ফ্যাসিস্ট জার্মানিতে হিটলারের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভোটের মাত্রাছাড়া খরচ জোগাচ্ছেন কারা

কথায় আছে লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন। কিন্তু কে বা কারা সেই গৌরী সেন, যাঁরা প্রায় প্রতি বছর ভোটের খরচ যোগান দিচ্ছেন? ২০২২-এ পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে পৌরসভা নির্বাচন, ২০২৩-এ পঞ্চায়েত, ২০২৪-এ লোকসভা, ২০২৬-এ হতে চলেছে বিধানসভার ভোট। বলা হয় এগুলি 'গণতন্ত্রের মহোৎসব'। কিন্তু এই মহোৎসবগুলির বিপুল খরচ জোগাচ্ছে কারা? নির্বাচন কমিশন, যারা গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করে, তাদের নিজস্ব আয়ের কোনও সংস্থান নেই। এই খরচ বহন করে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। নিয়ম অনুযায়ী কোনও রাজ্যে বিধানসভা ভোট হলে যে মোট খরচ হয় তার ৩০ শতাংশ কেন্দ্র এবং ৭০ শতাংশ সেই রাজ্যের সরকার বহন করে। আবার লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ৭০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারগুলি ৩০ শতাংশ ব্যয়ভার বহন করে থাকে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন

মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন দলের উত্তর কলকাতার ৭ প্রার্থী। ১ এপ্রিল

এসইউসিআই(সি)-কে জয়ী করুন

একের পাতার পর

থাকতে পারে। এ কি কোনও গণতান্ত্রিক আচরণ?

এসআইআর প্রক্রিয়ায় একের পর এক ফতোয়া জারি করে নাগরিকদের যে ভাবে হয়রানি করা হয়েছে, তা কোনও সভ্য সমাজে চলতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় বিএলও সহ দ্বিশতাধিক মানুষের মৃত্যুর জন্য নির্বাচন কমিশন হত্যাকারীর কাঠগড়ায়। আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এসআইআর-এর এই প্রক্রিয়া নাগরিকত্বের উপর আক্রমণ, ঘুরপথে এনআরসি চালু করার ষড়যন্ত্র। এর বিভীষিকাময় পরিণাম আসামের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। ইতিমধ্যে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া শেষ হয়েছে। ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। বাতিল করা মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ সংখ্যালঘু, চা বাগান সহ-দরিদ্র শ্রমিক, কৃষক, মতুয়া, মহিলা, জনজাতি আদিবাসী গোষ্ঠী।

নির্বাচনের দিন ঘোষণার সময় ‘একজনও বৈধ ভোটারকে ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হবে না’ বলে নির্বাচন কমিশন যে ঘোষণা করেছিল, আজ তা চূড়ান্ত প্রহসনে পর্যবসিত। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি, প্রখ্যাত আইনজীবীরাও এর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু বিজেপির লেজুড় হওয়ার ফলে নির্বাচন কমিশন গণতন্ত্রের কোনও তোয়াক্কাই করছে না। তাই আমাদের সুস্পষ্ট দাবি, ২০২৫ সালের তালিকায় যারা এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন তাদের সকলকেই ভোট দেওয়ার অধিকার দিতে হবে।

মানুষের জীবনের জ্বালা যন্ত্রণা জীবিকার প্রশ্নকে পিছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপির প্রধান স্লোগান অনুপ্রবেশ। যে বিপুল সংখ্যক মানুষ তালিকা থেকে বাদ পড়লেন, তাঁরা সকলেই কি অনুপ্রবেশকারী? তালিকাথেকে বাদ পড়া প্রাক্তন বিচারপতি, নন্দলাল বসুর নাতি, প্রাক্তন সাংসদ সহ নানা পদাধিকারী এবং এমনকি নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত বহু ব্যক্তির নাম বাদ গেছে। তাঁরা সবাই অনুপ্রবেশকারী? এস আই আর-এর মাধ্যমে কোথায় কত অনুপ্রবেশকারী পাওয়া গেছে, বিজেপি বা নির্বাচন কমিশন কি তা বলতে পারছে? কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ অন্য বিজেপি নেতাদের দেওয়া পরিসংখ্যান মিলছে না। অথচ ভোটের প্রচারে মিথ্যা পরিসংখ্যান আউড়ে তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ সৃষ্টি করে উগ্র ধর্মীয় উন্মাদনার মাধ্যমে যে ভাবেই হোক ভোট পাওয়ার নেশায় মত্ত বিজেপি।

তৃণমূল কংগ্রেসও বিজেপির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও ধর্ম নিয়ে রাজনীতির মধ্যেই তারা জনগণের দৃষ্টি আটকে রাখতে চাইছে। রাজ্যে বাবরি মসজিদ, জগন্নাথ ধাম, দুর্গা অঙ্গন তৈরির প্রতিযোগিতা চলছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি জনগণের মূল সমস্যাগুলির সমাধানের কোনও কথা না বলে দান-খয়রাতির প্রতিশ্রুতি ও পাল্টা প্রতিশ্রুতির এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা থাকুক আর না থাকুক, এ ক্ষেত্রে কংগ্রেসও পিছিয়ে নেই। দুঃখজনক ভাবে, গণআন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে সিপিআই(এম)-ও একই ধরনের প্রতিশ্রুতি বিতরণ করছে। অবশ্য বছরের পর বছর ধরে পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এইসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির ফলাফল কী হতে পারে তা জনগণ ভালভাবেই জানে। এগুলি যে ‘জুমলা’ বা কথার কথা, তা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন। তারই সাথে এ বারের নির্বাচনে এই সব দলের প্রার্থীরা সস্তা জনপ্রিয়তা আদায়ের জন্য প্রচারের সময় এমন সব কাজ করে ভোট পাওয়ার চেষ্টা করছেন যা রাজনীতির মর্যাদাকে ধূলায় মিশিয়ে দিচ্ছে।

২০২৫ সালের ভোটার তালিকার ভিত্তিতে নির্বাচন করার দাবিতে ৮ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এসডিও দপ্তরে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

তৃণমূল শাসিত এ রাজ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা সহ সর্বস্তরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ। আর, বিজেপি গোটা দেশে এবং তাদের শাসিত রাজ্যে একই ভাবে দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত। এ রাজ্যে কাজ না পেয়ে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিচ্ছে যুবকরা। গিগ কর্মীদের অসহনীয় অবস্থা। বেকারি এ রাজ্যে যেমন, তেমনি এ দেশেও রেকর্ড ছুঁয়েছে। ইউক্রেনের যুদ্ধে কামানের গোলার মুখে যুবকদের তুলে দিয়েছিল বিজেপি সরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ভারতীয়দের হাতে পায়ে শেকল পরিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়েছিল, তবু ট্রাম্প নরেন্দ্র মোদির বন্ধু। ইজরায়েলের যে প্রধানমন্ত্রী প্যালেস্টাইনে, ইরানে গণহারে শিশু-নারী-বৃদ্ধদের হত্যা করছে, তার সাথে প্রধানমন্ত্রীর কোলাকুলি ভারতবাসীর লজ্জা। আমেরিকার সাথে বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে কৃষিজাত দ্রব্য, খাদ্যশস্য, দুধ, দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার দখল করবে আমেরিকা। কৃষকদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হবে। বর্তমানে এ দেশে প্রতিদিন ৪৮ জন কৃষক আত্মহত্যা করেন। তৃণমূলের শাসনে নারী নির্যাতন দিনের পর দিন বাড়ছে। আর বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি নারী নির্যাতনে শীর্ষে। আদানি-আম্বানিদের সম্পদ বাড়ছে। পরিবেশ ধ্বংস করে বনাঞ্চল, খনিজ সম্পদ তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে বিজেপি। আসলে, এই দলগুলি যে যখন যেখানে ক্ষমতায়, সেখানে তারা অপশাসনের প্রতিমূর্তি। এদের মধ্যেই এক দলের বদলে অন্য দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য মানুষকে নানা প্রচারে বিভ্রান্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

দুঃখজনক হলেও এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিবর্তে শুধুমাত্র কিছু আসন বাড়ানোর লক্ষ্যে ২০১৬ সাল থেকে সিপিআই(এম) দল প্রথমে কংগ্রেসের সাথে জোট করেছে, ২০২১ সালে আইএসএফ নামক মৌলবাদী শক্তির সঙ্গেও হাত মিলিয়েছে। এ বছরের নির্বাচনে কংগ্রেস চায়নি বলে ঐক্য হয়নি— কিন্তু আই এস এফ-এর সঙ্গে ঐক্য করেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে রাজ্যের সর্বত্র ‘আগে রাম পরে বাম’ আওয়াজ তুলে তাদের ভোট বিজেপির ঝুলিতে তুলে দিয়ে বিজেপির শক্তিবৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। তার ফলে শুধু ভোটটুকুই যায়নি, তাদের কর্মী-সমর্থকদের একটি বিরাট অংশও বিজেপির পক্ষে চলে গিয়েছে। বামপন্থী মানুষ তাঁদের এই আচরণে খুবই মর্মাহত ও বিভ্রান্ত।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সংগ্রামী বামপন্থার পথে চলছে এবং এটাই জনগণের সামনে প্রকৃত বিকল্প। নির্বাচনী সংগ্রামে এস ইউ সি আই (সি)-র গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য, বিজেপির মতো যে স্বৈরাচারী শক্তি গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আঘাত হেনে চলছে তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই করা, নির্বাচনে পরাস্ত করা। আবার বিজেপির বিরোধিতার সঙ্গে সঙ্গেই চরম ও সর্বব্যাপক দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বজনপোষণকারী, নারী সহ নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং শোষিত মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষায় ব্যর্থ রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসকেও পরাস্ত করা। নির্বাচনী রাজনৈতিক লড়াইয়েও আমরা গণআন্দোলনের প্রকৃত বিকল্প পথকেই তুলে ধরছি এবং এ পথেই আমরা থাকব। অতীতে বিধানসভার অভ্যন্তরে যেমন করে কমরেডস সুবোধ ব্যানার্জী, প্রতিভা মুখার্জী, হরিপদ বাউড়ি, রবীন মণ্ডল, দেবপ্রসাদ সরকার, প্রবোধ পুরকায়েত, বিজয় বাউড়িরা এবং পরবর্তীকালে তরুণকান্তি নস্করা এবং লোকসভায় তরুণ মণ্ডল নির্বাচিত হওয়ার পর সংসদের ভেতরে ও বাইরে প্রতিবাদের কণ্ঠকে উচ্চে তুলে ধরেছিলেন, এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীরা জয়ী হলে সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন, এটাই আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি।

কোন বিচারে ভোটার বাতিল
চিঠি প্রধান বিচারপতিকে

বিচারাধীন ভোটারদের কেন বাদ দেওয়া হল, তা ভোটারদের জানানো হল না। এটা কেমন বিচার? প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিলেন বুদ্ধিজীবী ও মানবাধিকার কর্মীরা।

সুজাত ভদ্র, কৌশিক সেন, শুভ্রাংশু চাকী, শুভেন্দু মাইতি, দিলীপ চক্রবর্তী, বিপ্লব চন্দ্র, রাজকুমার বসাক প্রমুখের প্রশ্ন, আদালত শুনানির প্রথম দিনই বলেছিল, কোর্ট গণহারে নাম বাদ হতে দেবে না। এখন উল্টোটাই ঘটছে। তাদের দাবি, আদালত এ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করুক।

সংবিধানের ৩২৫ ও ৩২৬ অনুচ্ছেদে ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নিরপেক্ষ ভাবে ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের যে কথা বলা হয়েছে, আজ তার উপরই চরম আঘাত এসেছে। তাঁরা দাবি জানান, দ্রুত সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বৈষম্যহীন তালিকা করা সম্ভব না হলে ২০২৫ সালের স্পেশাল সামারি রিভিশনের ভিত্তিতে তৈরি তালিকা ধরে ভোট করা হোক।

বৈধ ভোটারদের অধিকার রক্ষায় সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে ৮ এপ্রিল জলপাইগুড়ি জেলা নির্বাচন আধিকারিকের দপ্তরে ডেপুটেশন। উপস্থিত সংগঠনের রাজ্য সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী শুভ্রাংশু চাকী

জীবনাবসান

নদিয়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র হরিণঘাটা লোকাল কমিটির আবেদনকারী সদস্য কমরেড ইসমাইল খান ২৮ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে তিনি হৃদরোগে ভুগছিলেন।

কমরেড ইসমাইল প্রায় ২৫ বছর আগে তৎকালীন লোকাল সম্পাদক কমরেড মহসিন মণ্ডলের মাধ্যমে দলের সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে দলের নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ সাহচর্যে নিয়মিত কর্মী হিসেবে কাজ করা শুরু করেন। সদা হাস্যময় বড় হৃদয়ের এই কমরেড জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শ বুকে বহন করে গেছেন। তাঁর বাড়ি ছিল দলের কর্মীদের একটা আশ্রয়স্থল। এলাকার জনগণের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় ও আত্মিক সম্পর্ক। শারীরিক অসুবিধার কারণে তিনি বাইরের কর্মসূচিতে যেতে পারতেন না, কিন্তু স্থানীয় সমস্ত কর্মসূচিতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। কর্মীরা তাঁর বাড়িতে গেলে, অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি দলের খোঁজখবর নিয়েছেন, গভীর আশা ব্যক্ত করেছেন দলের অগ্রগতির বিষয়ে।

৭ এপ্রিল প্রয়াত কমরেড ইসমাইল খানের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির বর্ষীয়ান কমরেড দুলাল ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড তুষার ঘোষ ও জেলা নেতৃবৃন্দ। স্থানীয় অনেক কর্মী আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে প্রয়াত কমরেড ইসমাইল খানের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস।

কমরেড ইসমাইল খান লাল সেলাম

ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে, একে অস্বীকার করার উপায় নেই

শিবদাস ঘোষ

আমাদের সমাজ— আমরা চাই বা না চাই— শ্রেণিবিভক্ত সমাজ, শোষক ও শোষিতে বিভক্ত সমাজ। এটা একটা সাদামাটা কথা। এর একদিকে কোটি কোটি শোষিত জনসাধারণ যারা শ্রমের বিনিময়ে কোনওমতে তাদের দিন গুজরান করছে, অপর দিকে মুষ্টিমেয় শোষক শ্রেণি যারা দেশের ধনসম্পদ যতটুকু রয়েছে তার মালিক এবং তার কর্তৃত্ব করছে— মানুষের পরিশ্রম দিয়ে দেশে ধনসম্পদ যতটা বাড়ছে মুনাফার মাধ্যমে তাকে তারা আত্মসাৎ করছে। তার ফলে দেশে শিল্পোন্নতি যতটুকু হচ্ছে, শিল্পবিকাশ যতটুকু হচ্ছে, যে সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে। সাধারণ মানুষের জীবনে তার ফল বর্তাচ্ছে না। দারিদ্র্য চরম আকার নিচ্ছে, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, সংস্কৃতির চূড়ান্ত অবক্ষয় ঘটছে, নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

এই যে সমাজ মূলত শোষক ও শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত, এটা কেউ চেয়েছে বলে হয়নি। আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একে অস্বীকার করার আমাদের উপায় নেই। আর যখন থেকে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তার পর থেকেই মানুষ হিসাবে, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, জেনেই হোক বা না জেনে, আমরা কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, জড়িয়েই বাস করি। কারণ উৎপাদনের সঙ্গে কোনও না কোনও প্রকারে সম্পর্ক স্থাপনা ব্যতিরেকে আমরা সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে বসবাস করতে পারি না। খাওয়া, পরা, জীবনধারণ প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই আমাদের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে একটা সম্পর্ক স্থাপনা করতে হয় এবং এই সম্পর্ক স্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা স্ব-ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। এখন এই যে সমাজে পরস্পরবিরোধী দুটো শ্রেণি রয়েছে তাদের পরস্পরবিরোধী দুটো স্বার্থবোধও রয়েছে। শোষক শ্রেণি প্রচলিত সমাজব্যবস্থা থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় বলে সব সময়ই সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য ধর্ম, অনুশাসন, যুক্তি, আদর্শবাদ, ন্যায়নীতি, আইনকানুন, অর্থনীতিশাস্ত্র— সমস্ত কিছুকে তারা গড়ে তোলে, তার সপক্ষে তারা প্রচার করে, যুক্তিজাল বিস্তার করে। অবশ্যই এগুলি তারা সমস্ত মানুষের স্বার্থের নামেই করে,

'সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য করছি' বলেই করে। কিন্তু আসলে এ সমস্তই তারা তাদের শ্রেণিশাসন এবং শোষণটিকে বজায় রাখার জন্যই করে। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখাই শোষক শ্রেণির স্বার্থ। আর এর থেকেই তার শ্রেণিস্বার্থবোধের জন্ম। ঠিক তেমনই একটা শোষণমূলক সমাজব্যবস্থায় যারা শোষিত হচ্ছে সেই মানুষগুলো, অর্থাৎ শোষিত শ্রেণিগুলো, শোষণমুক্তির জন্যই শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাটাকে পাল্টাতে চায় যাতে সমাজের বেশিরভাগ মানুষ যারা শোষণে জর্জরিত হচ্ছে তারা শোষণ থেকে মুক্তিলাভ করে সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে পারে, অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশসাধন করতে পারে এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই দেখা যায় শ্রেণিবিভক্ত সমাজে ইতিহাসের সমস্ত স্তরে শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা ভেঙে ফেলে বেশিরভাগ মানুষের অগ্রগতি ও উন্নতির সাথে সঙ্গতি রেখে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটাতে সক্ষম— এরূপ একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা সবসময়েই শোষিত শ্রেণিগুলি গড়ে তুলতে চেয়েছে। সুতরাং যুগে যুগে শোষণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলাই শোষিত মানুষের স্বার্থ। আর এর থেকেই তার শ্রেণিস্বার্থবোধের জন্ম।

তাই শোষক ও শোষিতে ভাগ হওয়ার পর থেকেই একটা দ্বন্দ্ব নিয়ত সমাজের অভ্যন্তরে শোষক শ্রেণি ও শোষিত শ্রেণির মধ্যে চলছে। অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে, রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি সমস্ত কিছুকে কেন্দ্র করে সমস্ত ক্ষেত্রে এই দুই পরস্পরবিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব নিয়তই চলছে। এই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে সংগ্রাম যখন একটা চরম রূপ নেয় তখন তা সরাসরি 'কনফ্লিক্ট' (সংঘর্ষ) বা বিপ্লবে পর্যবসিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পুরনো রাষ্ট্রব্যবস্থা পাল্টে যায় এবং তার পরিবর্তে আর একটা নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজব্যবস্থার স্থাপনা হয়।

শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর সমাজ যে বারে বারে পাল্টেছে, সমাজ পাল্টাবার সেই প্রতিটি ক্ষেত্রেই মৌলিক নিয়মটি হচ্ছে— সমাজ অভ্যন্তরে শোষক এবং শোষিতের যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব চলতে চলতে যখন একটা চরম পরিণতিতে পৌঁছায়, যখন আর কোনও মতেই একই সমাজের অভ্যন্তরে শোষক এবং শোষিত আপস করেও চলতে পারে না, জীবনযাপন করতে পারে না— তখন একটা চূড়ান্ত মোকাবিলার সময় আসে এবং এই চূড়ান্ত মোকাবিলার মধ্য দিয়ে শোষিত শ্রেণি শোষক শ্রেণিকে উৎখাত করে দিয়ে একটা নতুন সমাজ, নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, নতুন নিয়ম, আইন-কানুন, রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রবর্তন করে। এই সামাজিক নিয়মনীতি, আইন-কানুন, শিক্ষাব্যবস্থা, সংস্কৃতি— যা কিছু আমরা দেখছি— এ সবই একটি বিশেষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে তার উপরিকাঠামো হিসাবে গড়ে ওঠে। এই সমস্ত কিছুকেই দেখভাল করবার ও রক্ষা করবার যন্ত্র হচ্ছে রাষ্ট্র।

তাই রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণির হাতে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার যার দ্বারা শাসক শ্রেণি তাদের সমস্ত 'ইনস্টিটিউশনস' (প্রতিষ্ঠানগুলি), সমস্ত কার্যকলাপ, অর্থনীতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের যত আন্দোলন এবং কর্মপ্রচেষ্টা— সমস্ত কিছুকে রক্ষা করে। তাই রাষ্ট্র হচ্ছে, এক কথায়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে কোনও না কোনও শ্রেণির হাতে শ্রেণিশাসনের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। ইতিহাসের ছাত্র হলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় কারও নেই। কেবলমাত্র অনৈতিহাসিক মনগড়া কথার দ্বারা গায়ের জোরেই এ কথা অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র গড়ে ওঠার ইতিহাস, রাষ্ট্রবিপ্লবের ও রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, সমাজ গড়ে ওঠা ও সমাজের অগ্রগতির ইতিহাস যদি আমরা অনুসন্ধান করি এবং জানতে পারি তা হলে যে কথাগুলি আমি বললাম তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি বর্তমানে কী, সেটা যথার্থ ভাবে নিরূপণ করতে হলে এই শোষক এবং শোষিতের মধ্যে কার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা আমরা সমস্যাগুলোকে বিচার করব— প্রথমে সেটাই ঠিক করে নেওয়া প্রয়োজন। আমরা যখন বলব দেশের বর্তমান পরিস্থিতি— তখন এই 'দেশ' কথাটাকে আমরা কাদের অর্থে ভাবব? দেশের পঞ্চান্ন কোটি মানুষের মধ্যে যারা তিপ্পান্ন কোটি মানুষ, যারা খেটে খায়, যারা অক্লান্ত শ্রমের দ্বারা দেশের সম্পদ তৈরি করছে, বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে গ্রামের অজ্ঞ চাষি এবং খেতমজুর পর্যন্ত তাদের নিয়ে ভাবব— তাদের নিয়েই তো দেশ, তাদের স্বার্থ, তাদের কল্যাণের কথা, তাদের ভবিষ্যতের কথা এই অর্থে দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবব এবং দেশের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করব? নাকি এই পঞ্চান্ন কোটি মানুষের মধ্যে যারা নিতান্তই মুষ্টিমেয় দু'এক কোটি লোক, যারা দেশের যা সম্পদ রয়েছে তার মালিক হয়ে বসেছে এবং যারা শোষণের রাস্তায় দেশের শ্রমশক্তিকে এবং মানুষের পরিশ্রমকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা লুটছে সেই অত্যাচারী শোষক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাদের স্বার্থে আমরা দেশের কথা ভাবব? শ্রেণিবিভক্ত সমাজে মালিক-মজুর, শোষক-শোষিত— উভয়ের স্বার্থ বলতে, উভয়ের দেশ বলতে এক এবং অভিন্ন স্বার্থবোধ নেই। হয় মালিকের স্বার্থে দেশাত্মবোধ, না হয় শোষিত জনসাধারণের স্বার্থে দেশাত্মবোধ। 'জাতীয় উন্নতি', 'জাতীয় অগ্রগতির সমস্যা'— এই সমস্ত কথা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গি বাদ দিয়ে এবং শ্রেণিস্বার্থের কথা উল্লেখ না করে, গোল গোল করে, ভাসাভাসা ভাবে যারা বলে তারা হয় ধাপ্পাবাজ, না হয় আকাট মূর্খ, হয় হাড় শয়তান, না হয় রাম মূর্খ। এ দুটোর যে কোনও একটা তারা বেছে নিতে পারে, কোনও আপত্তি নেই। 'সকলের স্বার্থ'— এ রকম কোনও জাতীয় স্বার্থবোধের কথা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে একমাত্র শয়তানেরাই বলতে পারে, না হয় অজ্ঞতার জন্য আকাট মূর্খের দল বলতে পারে। যারা সত্য কথা বলতে চায়, যারা ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে, যারা জনসাধারণের কথা বলবে, যারা শ্রমিক-চাষি-খেতমজুর ও অন্যান্য শোষিত মানুষের কথা বলবে তারা এ রকম ভাসাভাসা ভাবে বলতে পারে না। তাদের বলতে হবে কোন শ্রেণির স্বার্থে, কার অর্থে দেশের স্বার্থবোধ?

'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে' বই থেকে

এই যে সমাজ মূলত শোষক ও শোষিত এই দুই ভাগে বিভক্ত, এটা কেউ চেয়েছে বলে হয়নি। আমাদের ভাল লাগুক আর নাই লাগুক, আমরা পছন্দ করি আর নাই করি, ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই সমাজ দুটো ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একে অস্বীকার করার আমাদের উপায় নেই। আর যখন থেকে উৎপাদন ও বণ্টনের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে সমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে তার পর থেকেই মানুষ হিসাবে, স্বেচ্ছায় হোকবা অনিচ্ছায়, জেনেই হোক বা না জেনে, আমরা কোনও না কোনও শ্রেণির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি, জড়িয়েই বাস করি। কারণ উৎপাদনের সঙ্গে কোনও না কোনও প্রকারে সম্পর্ক স্থাপনা ব্যতিরেকে আমরা সামাজিক জীব হিসাবে সমাজে বসবাস করতে পারি না।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে

শিলাবতী বাঁচানোর বার্তা এসইউসি প্রার্থীর

গড়বেতা ঃ চুরি। দখলদারি। দূষণ। নীরবে সব দেখছে শিলাবতী। বিস্তীর্ণ দু-পাড়ের অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও, নিঃশব্দে, নীরবে তুমি বইছ কেন? শিলাবতীর কাছে এ অনুযোগ জানাচ্ছেন তাপস মিশ্র। তিনি গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি প্রার্থী। ভাতা, অনুপ্রবেশ বাঙালি অস্মিতার মতো বিষয়কে পাশে সরিয়ে তিনি বলছেন নদী বাঁচানোর কথা। দিচ্ছেন প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার বার্তা। বাকি রাজনৈতিক দলগুলি অবশ্য শিলাবতীতে ছুঁড়ছে পুরনো সেই রাজনীতির শিলাই।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াকালীন রাজনীতিতে প্রবেশ। তাপস এখন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী। মানুষের কাছে গিয়ে তিনি বার্তা দিচ্ছেন শিলাবতী নদী রক্ষার। বৃহস্পতিবার আমলাশুলি এলাকায় লিফলেট ছড়িয়ে তাপস বলছেন, 'আমাদের নদীমাতৃক দেশ। শিলাবতী গড়বেতার উপর দিয়ে প্রবাহিত। এই নদী প্রতিদিন ধর্ষিত হচ্ছে। বালি চুরি তো আছেই, নদী দখল করে অবাধে রাস্তা, ঘর, কৃষিকাজ হচ্ছে। প্রতিনিয়ত শিলাবতী দূষিত হচ্ছে। সেই নদীকে আমাদের রক্ষা করতেই হবে।" শিলাবতী গড়বেতাকে কখনও ডোবায়, কখন শস্যশ্যামলা করে তোলে। গত বছর জুন মাসে নাগাড়ে বর্ষণে শিলাবতীতে বন্যা হয়। ভয়াবহ সেই বন্যায় প্লাবিত হয় শতাধিক গ্রাম। জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল ১৪টি অঞ্চল। অনেকে বলেন, ১৯৭৮ সালে শিলাবতীর সেই প্রলয়ঙ্করী বন্যার স্মৃতি উস্কে দিয়েছিল গত বছরের জুনের বন্যা। দীর্ঘকাল সংস্কার না হওয়ায় মাঝে মধ্যে বিপদ বাড়ায় শিলাবতী। এই নদীর তীরে আমলাশুলিতে এক গ্রামে বাড়ি তাপসের। নদীকে ধীরে ধীরে বদলে যেতে দেখেই বড় হয়ে উঠেছেন। তাই মানুষের দৈনন্দিন সমস্যা, রুটিরুজির সমস্যার সঙ্গে নদীর সঙ্কটও জুড়ে থাকে তাঁর রাজনীতিতে। তাঁর কথায়, 'শিলাবতীর উপর ভয়ঙ্কর অন্যায় হচ্ছে। তাই প্রতিবাদ করছি। বছর পাঁচেক ধরেই এই নদী বাঁচানোর কথা বলে আসছি।"

গড়বেতায় যুযুধান দুই শিবিরের ভোটের প্রচারে শিলাবতী নদীর দূষণ বা নদী চুরি নিয়ে তেমন কোনও কথা নেই। কেন? তৃণমূল প্রার্থী উত্তরা সিংহ বলেন, "বাংলার সব নদী বাঁচাতে আমাদের সরকার উদ্যোগী হয়েছে। শিলাবতীতে ড্রেজিং করে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রাজ্য সরকার করছে। আমরা তো প্রচারে বলছি এ সব।" (আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ১০ এপ্রিল ২০২৬)

দুয়ারে চিকিৎসা ভাঁওতা, বলছেন ডাক্তার শামস

কলকাতা ঃ এন্টালি কেন্দ্রের এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী হিসেবে এ বারের ভোটে লড়ছেন শামস মুসাফির। পেশায় চিকিৎসক এই প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে জনস্বাস্থ্য, প্রান্তিক মানুষের অধিকার এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধেজোরালো প্রতিবাদ। বাঁকুড়ার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই চিকিৎসক সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা খুব ভাল করেই বোঝেন, আর তাই নিজের পেশাকে তিনি ব্যবহার করছেন জনসেবার হাতিয়ার হিসেবে।

সাম্প্রতিক আরজি কর আন্দোলনে সামনের সারিতে থেকে লড়াই করেছেন শামস। রাতদখল কর্মসূচি থেকে শুরু করে টানা আন্দোলনের সূত্রে এলাকার মানুষের কাছে তিনি পরিচিত মুখ। তবে তাঁর এই পরিচিতি শুধু আন্দোলনের ময়দানেই আটকে নেই। এন্টালির বস্তি এলাকাগুলিতে একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে। ঘিঞ্জি ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, ডায়রিয়া থেকে শুরু করে নানা রকম চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই ধরনের স্বাস্থ্য সঙ্কটের সময়ে তিনি ও তাঁর দলের কর্মীরা প্রান্তিক এলাকাগুলিতে নিয়মিত বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্পের আয়োজন করেন। গরিব খেটে-খাওয়া মানুষদের স্বাস্থ্যের খোঁজ অন্য রাজনৈতিক দলগুলি না রাখলেও এই ধারাবাহিক কাজ তাঁকে ভোটারদের কাছে এক ভরসার জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলেই দাবি শামসের। আর সেই পরিচিতি ভোটের ময়দানেও তাঁকে এগিয়ে রাখছে বলে মনে করছে দল। শামস বলছেন, 'এলাকার বহু মানুষ আরজি কর আন্দোলনের কারণে হোক বা মেডিক্যাল ক্যাম্প— আমাকে চেনেন।'

ভোটের প্রচারে বেরিয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণের তীব্র বিরোধিতা করছেন। শাসকদল তৃণমূলের ইস্তেহারে থাকা 'দুয়ারে চিকিৎসা'র প্রতিশ্রুতিরও কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়ন না করে এবং

এন্টালিতে প্রচার মিছিলে ডাঃ সামস মুশাফির

নিয়মিত চিকিৎসক-নার্স নিয়োগ না করে শুধুমাত্র কিছু ট্রেনি ডাক্তার দিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে চিকিৎসা করানোর কথা বলাটা আসলে এক বিরাট ভাঁওতা। শামস স্পষ্ট ভাষায় ভোটারদের বোঝাচ্ছেন, স্বাস্থ্যসাথী বা আয়ুষ্মান ভারতের মতো স্বাস্থ্যবিমা নির্ভর প্রকল্পগুলি আসলে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে তিল তিল করে ধ্বংস করে কর্পোরেট হাসপাতালগুলিকে মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছে।

তাই দুয়ারে চিকিৎসা সমাধান নয়, বরং সরকারি হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির হাল ফেরাতে যেন মানুষ তাঁকে বেছে নেন। শামসের স্পষ্ট বার্তা, সাময়িক প্রলেপ বা চমক নয়, সরকার যদি সত্যিই গরিব মানুষের বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে চায়, তবে বর্তমান ত্রিস্তরীয় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকেই আরও উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে।

ভোটের আবহে লড়াকু চিকিৎসক হিসেবে তিনি মানুষকে নিখরচায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা বাঁচানোর লড়াইয়ে শামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। স্ত্রী, সাড়ে তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে পার্টির কমিউনেই সংসার তাঁর। ফলে ভোটের আবহে সন্তানকে সময় দিতে না-পারা দম্পতি মেয়ের জন্যে চিন্তিত নন। কারণ মেয়েকে দেখার জন্যে পার্টিকর্মীরাই আছেন!

(এই সময়। ১২ এপ্রিল, ২০২৬)

এক বছরে দেশে ঘৃণাভাষণ ৭৪ শতাংশ বেড়েছে

ভারতে ২০২৩ সালের তুলনায় ২০২৪ সালে ঘৃণা-ভাষণ ৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনিক তথ্য বিশ্লেষণ করে সমীক্ষা দেখাচ্ছে, ২০২৪ সালে ১১৬৫টি ঘৃণাভাষণ হয়েছে। তার মধ্যে নির্বাচন চলাকালীন হয়েছে ৩৭৩টি। নির্বাচন এবং অন্য সময় ধরে যে অশ্রাব্য ঘৃণাভাষণ শীর্ষ নেতাদের শ্রীমুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, তার মধ্যে ১০৫০টির আক্রমণের নিশানা ছিল মুসলিমরা। অর্থাৎ ঘৃণাভাষণের ৯০ শতাংশ ছিল মুসলিমদের বিরুদ্ধে। ১১৫টি ছিল খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে। তথ্য দেখাচ্ছে, এর মধ্যে বিপদজ্জনক ঘৃণাভাষণ ছিল ২৬৯, যেখানে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের ডাক দেওয়া হয়েছিল ১২৩টিতে। ১১১টি ভাষণে এদের বয়কট করার ডাক দেওয়া হয়েছিল।

দেশ জুড়ে ঘৃণার এই বে-আব্রু চর্চা করছে কারা? কেন্দ্রে ২০১৪ সাল থেকে মোদি সরকার। বেশির ভাগ রাজ্যে বিজেপি সরকার। এদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশ জুড়ে হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণার অগ্নুৎপাত ঘটে চলেছে। ঘৃণা ভাষণের উপর আন্তর্জাতিক এক গবেষণা সংস্থার সমীক্ষা বলছে, গত লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজ্যে ২৭টি ঘৃণাভাষণ সংবলিত সভার প্রমাণ মিলেছে। ক্ষমতাসীন দলগুলির নেতারা এই ঘৃণ্য পথে কেন যাচ্ছেন বেশি করে? কারণ ঘৃণাভাষণ ভোটের মেরুকরণে সাহায্য করে। এতে তাদের ভোটে জিততে সুবিধা হয়। কিন্তু সমাজে তা সৃষ্টি করে যায় গভীর মানসিক ক্ষত, যার কুফল ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে বছরের পর বছর ভুগতে হয়।

বিজেপির ঘৃণা ভাষণের অন্যতম অভিমুখ মুসলিম জনগোষ্ঠী। মুসলিম তোষণ সত্যিই হয়ে থাকলে তার প্রভাব পড়ত তাদের অর্থনৈতিক অবস্থায়, প্রভাব পড়ত চাকরির পরিসংখ্যানে। তা পড়েছে কি? বাস্তব তথ্য বলছে, মুসলিমদের মধ্যে দারিদ্র বেশি, অভাব অনটন বেশি। সরকারি চাকরিতে মুসলিমদের অংশীদারিত্ব কম। এটাকে কি বলা যায় মুসলিম তোষণের ফল? নাকি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সহ সকল অংশের মানুষের উপর পুঁজিবাদী শোষণ ও সরকারি বঞ্চনার ফল?

তারস্বরে কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতারা বলে চলেছেন, পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তান বানানোর চক্রান্ত চলছে। দলে দলে মুসলিমরা, রোহিঙ্গারা ভারতে ঢুকে যাচ্ছে। তারা এখানে জনবিন্যাস পাল্টে দিচ্ছে। এখানকার জমি দখল করে নিচ্ছে। সরকারি সুবিধায় ভাগ বসাচ্ছে। এইসব বক্তব্যের সারবত্তা কতটুকু, সাধারণ মানুষ বহু সময় তা ধরতে পারেন না। অনেক সময় তারা এই প্রচারে প্রভাবিত হয়ে বিজেপির বক্তব্য সত্যি বলে ধরে নেন। এই বিচারহীন মানসিকতা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর। এই অন্ধতা ফ্যাসিবাদের জমি তৈরি করে।

এই ফ্যাসিবাদী মানসিকতার এক নগ্ন রূপ দেখা গেল সম্প্রতি হাওড়ার ডোমজুড়ে। ডোমজুড়ের জগদীশপুরে এক মুরগির মাংস বিক্রেতাকে বাংলাদেশি বলে দেগে দিয়ে তাঁর দোকান জোর করে বন্ধ করে দেন সেখানকার বিজেপি প্রার্থী। স্থানীয় মানুষের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আনন্দবাজার পত্রিকা লিখেছে, ওই ব্যক্তি বাংলাদেশি নন, বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা এবং গত দেড় বছর ধরে জগদীশপুরের বাজারের কাছে রাস্তার ধারে ব্যবসা করছেন। এ ভাবে বিজেপি আইন নিজের হাতে তুলে নিয়ে স্বাভাবিক সামাজিক পরিস্থিতিকে বিষিয়ে তুলছে।

ঘৃণা, উগ্র বিদ্বেষমূলক বক্তব্য ছাড়া বিজেপি কেন তার রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে পারছে না? কারণ তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অপশাসন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, নারী নিরাপত্তা, বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে বলার নৈতিক অধিকার তারা হারিয়েছে। এই সমস্যাগুলির প্রত্যেকটি বিজেপি শাসিত রাজ্যে মানুষকে পিষে মারছে। বাস্তবে এই সমস্যাগুলি তৈরি হয়েছে অথবা তীব্র রূপ নিয়েছে পুঁজিপতিদের স্বার্থে দেশের অর্থনীতি এবং শাসন পরিচালনার ফলে। সেটা কেন্দ্র এবং রাজ্য সব ক্ষেত্রেই হয়ে চলেছে।

এসব নিয়ে এই দলগুলির মধ্যে কোনও মৌলিক বিরোধ নেই। অথচ ভোটের জন্য পরস্পর বিরোধিতার আবহাওয়া তৈরি করতেই হয়। এবারের নির্বাচনে বিজেপি এই অনুপ্রবেশ প্রচারকেই এ কাজে ব্যবহার করছে। মুসলিম বিরোধী আওয়াজ তুলে হিন্দু ভোটকে ঐক্যবদ্ধ করা, মুসলিমদের নাম ব্যাপকভাবে বাতিল করে নির্বাচনে জয়লাভ করা, এই হীন উদ্দেশ্যেই যে এসআইআর এবং লাগামহীন ঘৃণা-ভাষণ তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

এসআইআর-এর আপিলের জন্য সহায়তা কেন্দ্র কোচবিহারে

বৈধ বাতিল ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে কোচবিহার জেলাশাসক দপ্তরের সামনে একটি বিশেষ সহায়তা কেন্দ্র বা হেল্প ডেস্ক চালু করেছে ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চ, কোচবিহার। এই উদ্যোগের সব থেকে উল্লেখযোগ্য দিক হল সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। সাধারণ মানুষের জটিল আইনি ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানে প্রতিদিন এই কেন্দ্রে উপস্থিত থেকেছেন আইনজীবী দিলীপ চন্দ্র বর্মন, ধ্রুব রায়, জুঁই রায়ের মতো অভিজ্ঞ আইনজীবী, শিক্ষক এবং বিভিন্ন পেশার সচেতন নাগরিকরা। দূর-দূরান্ত থেকে আসা প্রান্তিক মানুষ যাঁরা ফর্ম পূরণ বা আপিল করার সঠিক পদ্ধতি জানেন না, তাঁদের হাতেকলমে সাহায্য করছেন এই স্বেচ্ছাসেবীরা।

ভোটাধিকার রক্ষা মঞ্চের কর্মীরা জানিয়েছেন, শুধুমাত্র নথিপত্রের জটিলতায় কোনও প্রকৃত নাগরিক যেন ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতেই এই নিরলস প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই মহৎ উদ্যোগে সামিল হয়ে শিক্ষক ও আইনজীবীরা দিনভর সাধারণ মানুষের আপিল প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করছেন, যা জেলায় ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে।

মোদিজির জানা উচিত শুধু হিন্দুরা নয় এ রাজ্যের মুসলমানরাও বাঙালি

বিধানসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে, সভায় সভায় বিজেপি নেতাদের ভাষণে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ ততই তীব্র হচ্ছে। সব ধর্মের মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্য রয়েছে যে রাজ্যে, সেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান বিদ্বেষ ছড়ানোই এ বার তাঁদের মূল অস্ত্র। ক্ষমতা দখলের উদগ্র লোভ এমন ভাবে তাঁদের চেতনা ছেয়ে রয়েছে যে, সেই অস্ত্রটি ব্যবহার করতে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিস্ময়কর ভাবে তাঁরা নানা অদ্ভুত মন্তব্য করে চলেছেন।

যেমন, মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে ১১ এপ্রিল নির্বাচনী সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন— 'বাঙালিদের সংখ্যালঘু হতে দেব না'। হিন্দু-মুসলিম বিভেদের এই রাজনৈতিক আবহে নরেন্দ্র মোদি 'বাঙালি' বলতে আসলে যে হিন্দুদেরই বোঝাতে চেয়েছেন, তা বুঝিয়ে বলার দরকার পড়ে না। প্রশ্ন হল, দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিজেপির অন্যতম সর্বভারতীয় নেতার এ কথাটুকুও কি জানা নেই যে, এই রাজ্যে বসবাসকারী প্রায় আড়াই কোটি মুসলমান ধর্মের মানুষের ৯০ শতাংশই 'বাঙালি' এবং তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা? তিনি কি জানেন না, বাংলা ভাষায় কথা বলেন না রাজ্যের মাত্র ১০ শতাংশ মুসলিম? এবং তাঁরাও কেউ 'অনুপ্রবেশকারী' নন। উর্দু বা হিন্দিভাষী এইসব মানুষ মূলত উত্তরপ্রদেশ ও বিহার থেকে রুটি-রুজির প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গে এসে বাসা বেঁধেছেন। আরও বিস্ময়কর, 'বাঙালি' নামক বৃহৎ বিভাগটি থেকে মুসলিম ধর্মের বাংলাভাষীদের মোদিজি অবলীলায় উপড়ে ফেলে দিতে চাইলেন খোদ মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুরে বসে! অথচ এই জেলার মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশই মুসলমান এবং তাঁদের মাতৃভাষা বাংলা! কে জানে প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে, তাঁর কথা শুনতে এমন কত শত বাঙালি মুসলমান সে দিনের সভাতেও হয়তো উপস্থিত ছিলেন! এই মন্তব্য শুধু তাঁদের মর্যাদাবোধে আঘাত করেছে তাই নয়, গোটা দেশের মানুষই প্রধানমন্ত্রীর এ হেন অজ্ঞতায় বিস্মিত, ক্ষুব্ধ। এ হলে তো নজরুল ইসলাম, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের মতো মহান ব্যক্তিত্বদেরও বাঙালি বলা চলে না! তাঁদের মনে এ প্রশ্নও মাথা চাড়া দিচ্ছে— তবে কি নরেন্দ্র মোদি জেনে বুঝেই 'বাঙালি' জাতিগোষ্ঠী থেকে চতুর কৌশলে মুসলমান ধর্মের মানুষদের বাদ দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছেন? তাই যদি হয়, তা হলে বলতেই হয় যে, বিজেপির সাম্প্রদায়িক বিভেদের রাজনীতি, ইতিহাস বিকৃতি ও নোংরামি আগেকার সমস্ত সীমা এ বার ছাড়িয়ে গেল এবং তার রাস্তা দেখাচ্ছেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি।

বাস্তবিকই, ভোটের লোভে বিভেদের বিষাক্ত রাজনীতির চর্চা করতে করতে অসত্যভাষণ আজ যেন বিজেপি নেতাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। জঙ্গিপুরের সভায় হিন্দুদের সংখ্যালঘু হয়ে পড়ার আশঙ্কা বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। অথচ সত্য হল, মুসলমান ধর্মের মানুষরা পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকও নন। খোদ সরকারি তথ্য বলছে, এ রাজ্যের জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ মুসলমান। শুধু তাই নয়, সারা ভারতে অন্য ধর্মের মানুষের মতোই মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে, যে কথার উল্লেখ ভুলেও বিজেপি নেতারা করেন না। সরকারি তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালে ২৯.৫ শতাংশ থেকে কমে ২০১১ সালে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২৪.৬ শতাংশে। তা হলে কিসের ভিত্তিতে এমন কথা বললেন মোদিজি? মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের 'জঙ্গি' কিংবা 'অনুপ্রবেশকারী' বলে দাগিয়ে দিয়ে তাদের বাড়বাড়ন্তের চূড়ান্ত মিথ্যা তথ্য প্রচার করে একটি রাজ্যের হিন্দু ধর্মের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো এবং তাঁদের ত্রাতা সেজে নিজেদের ভোটবাক্স ভরানো— শুধু এই লক্ষ্যে চূড়ান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো এমন আচরণ দেশের প্রধানমন্ত্রীকে মানায় কি?

মোদিজির সুরে সুর মিলিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ওই দিনই পুরুলিয়ার এক সভায় হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন— "বাংলায় ইউসিসি (অভিন্ন দেওয়ানি বিধি) চালু হবে। ... আইন সবার জন্য সমান হবে। ... চার বিয়েতে এমনিতেই নিষেধাজ্ঞা হয়ে যাবে" ইত্যাদি ইত্যাদি। স্পষ্ট যে, মোদির মতো তাঁর বক্তব্যের অভিমুখও সেই মুসলমান সমাজ এবং তাঁর যত মাথাব্যথা মুসলমানদের একাধিক বিবাহ নিয়েই। এ ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদির মতোই অমিত শাহও কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ গোপন করে অবাধে অসত্য ভাষণ দিলেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কি জানা নেই, আজকের দিনে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই একাধিক বিবাহ নেহাতই ব্যতিক্রমী ঘটনা? খোদ সরকারি তথ্যই তো সে কথাই বলছে! জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএস) ২০১৯-'২১-এর রিপোর্টই দেখাচ্ছে, দেশের মুসলমান জনসংখ্যার মাত্র ২.৮ শতাংশের একাধিক স্ত্রী রয়েছেন। হিন্দুদের মধ্যে একাধিক বিবাহে আবদ্ধ ১.৬ শতাংশ। এ সব জানা সত্ত্বেও স্রেফ ভোটের লোভে ভারতের একটি বিশেষ ধর্মের বৈধ নাগরিকদের নিয়ে এ ভাবে মিথ্যাচার করতে পারলেন একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী! দেশের মানুষের গভীর ভাবে ভেবে দেখা দরকার, সমাজে এ ভাবে বিভেদের বিষ ছড়ানো এই সব মন্ত্রীদের দেশ পরিচালনার যোগ্যতা এক কানাকড়িও রয়েছে কি না।

আসলে কেন্দ্রে এক দশকের বেশি সময় ক্ষমতায় থেকে এবং রাজ্যে রাজ্যে তাঁদের শাসনে বিজেপি সরকার মানুষের কল্যাণে এমন কিছুই করতে পারেনি যেটা দেখিয়ে নেতারা মানুষের সমর্থন আদায় করতে পারেন। তা ছাড়া বছরের পর বছর ধরে অসত্য ভাষণ ও মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত দেশের মানুষের কাছে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা যে হারিয়ে গেছে, তা টের পেয়েছেন বিজেপি নেতারা। তাই ভোটে জিততে মরিয়া হয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন তৈরি করে ভোটবাক্সে তার ফয়দা তোলার চেষ্টা করে চলেছেন তাঁরা। নেতারা তাই সত্য-মিথ্যার বাছবিচারটুকুও ত্যাগ করেছেন।

আজ মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, অশিক্ষা, চিকিৎসাহীনতা, দুর্নীতিতে জেরবার হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত মানুষ। রাজ্যের অপদার্থ তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মতোই জনজীবনের এইসব মূল সমস্যা সমাধানে সামান্য সচেষ্ট হতে দেখা যায়নি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন বিধানসভা ভোটে রাজ্যের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে যাতে তাঁরা বিজেপি নেতাদের এই মিথ্যার ফাঁদে পড়ে প্রতারিত না হন।

নির্বাচনী প্রচারে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

পানিহাটি

কেশপুর

'বুঝলাম, সমাজ সম্পর্কে কমরেড শিবদাস ঘোষের উপলব্ধি কতখানি গভীর'

কমরেড শিবদাস ঘোষ এক আলোচনায় বিপ্লবী কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, আর্থিক ক্ষমতা না থাকলেও আন্দোলনের প্রয়োজনে লড়াইয়ের প্রয়োজনে যাতায়াতের জন্য ট্রেনে ওঠো। যদি টিটি টিকিট চাইতে আসে তার চোখে চোখ রেখে দৃঢ় ভাবে অনুরোধ করো, বলো ঘুরতে বেড়াতে নয়, সমাজের প্রয়োজনে, আন্দোলনের স্বার্থে ট্রেনে উঠেছ।

এআইডিওয়াইও-র এক কর্মী বললেন, যত বার এই জায়গাটা পড়েছি তত বারই মনে হয়েছে, এগুলো বলা হয়তো যায়, কিন্তু কোনও টিটির ওপরে তার প্রভাব আদৌ পড়বে কি? নিছক আবেগসর্বস্ব কথা মনে হবে না তো? আবার এও ভাবতাম যে, উনি এই কথাগুলো বলেছিলেন পঞ্চাশ অথবা ষাটের দশকে, তখনকার রেল ডিপার্টমেন্টের কথা মাথায় রেখে। আজ ২০২৬ সালে এই সব কথার কতটুকু বাস্তবতা বা সারবত্তা আছে?

সম্প্রতি এআইডিওয়াইও-র মিছিলের কর্মসূচি ছিল কলকাতায়। সকল বেকারের কাজের দাবি এবং শূন্যপদ পূরণের দাবিতে কলকাতায় রাজভবনের সেই বিক্ষোভ থেকে ফেরার পথে পশ্চিম বর্ধমানের এবং পুরুলিয়ার মোট ছ'জন যুবকর্মী বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠেছিলেন। যাতায়াতের বারেশো টাকা তারা জোগাড় করে উঠতে পারেননি। এই দলে ওই কর্মীও ছিলেন।

ট্রেন আসানসোলে ঢোকার ঠিক আগে একজন টিকিট চেকার চেকিং শুরু করেন। কর্মীটি বলেন, টিটি অন্যান্য যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করতে করতে আমাদের কাছে এলেন। সবাই একটু টেন্সড হয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে কোনও সিনিয়র কর্মীও নেই। উনি এক কর্মীর কাছে এসে বললেন, টিকিট দিখাইয়ে।

কর্মীটি বললেন, স্যার হমলোগ কলকাত্তা গয়ে থে জুলুস মে। এআইডিওয়াইও যুবা সংগঠন সে জুড়ে হুয়ে হ্যায়। টিকিট পরীক্ষক গম্ভীর মুখে অন্য একজন যাত্রীর টিকিট চেক করতে করতে বললেন— হম আপসে টিকিট মাঙ্গ রহে হ্যায়, আউর আপ হমকো কাহানি সুনা রহে হ্যায়? টিকিট দিখাইয়ে।

টিটি সাহেবের এই রকম উত্তর শুনে ভাল রকম ফাইন দিতে হবে মনে করে সঙ্গীরা সবাই উদ্বিগ্ন।

হঠাৎ কর্মীটির কমরেড শিবদাস ঘোষের সেই কথাগুলো মনে পড়ে যায়— সৎ ভাবে বলো, দৃঢ় ভাবে বলো— ঘুরতে যাইনি, গণআন্দোলনের স্বার্থে গেছি।

তিনি বললেন, এই বার টিটির চোখে চোখ রেখে নম্র অথচ দৃঢ় ভাবে বললাম, স্যার কঁহি ঘুমনে ফিরনে নহি নিকলে থে, অন বিহাফ অফ আ ইয়ুথ মুভমেন্ট কলকাতা গয়ে থে।

চেকার বললেন - ক্যা ইস্যু থা?

বেরোজগারিকে খিলাফ আউর সভি সরকারি খালি পদোঁমে রিক্রুটমেন্ট কি মাঙ্গ লেকর, হজারোঁ কে তাদাদ পে মাস সিগনেচর লেকর এক ডেপুটেশন প্রোগ্রাম থা। এআইডিওয়াইও সে হ্যায় হমলোগ। সংগঠন কা হমারে ইউনিটকে পাস ইতনে সারে সাথীয়োঁকা টিকিট বনানেকা সামর্থ্য নহি হ্যায়।

টিটি কর্মীর দিকে তাকিয়ে বোঝার ভঙ্গিতে সামান্য মাথাটা নেড়ে বললেন, ইটস অলরাইট। তারপর সামনে এগিয়ে গেলেন।

কর্মীটি বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

উনি কর্মীটির দিকে আর না তাকিয়েই সামনে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, ওকে।

কর্মীটি বললেন, আমি সারা রাস্তা শুধু এটাই ভাবতে ভাবতে এসেছি যে, কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার জোর কতটা আর সমাজের বিষয়ে, মানুষের বিষয়ে তাঁর ভাবনা আজও কতখানি প্রাসঙ্গিক এবং অভ্রান্ত।

মহিষাদল ও নন্দীগ্রামে দলীয় প্রার্থী সহ নির্বাচনী প্রচার মিছিল

দলের উদ্যোগে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ রচিত কয়েকটি পুস্তিকা নিয়ে ২৭-২৯ মার্চ তিন দিনের রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির হয় মধ্যপ্রদেশের ভোপালে। শিবির সঞ্চালনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অরুণ কুমার সিং। দলের মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড প্রতাপ শামল আলোচনায় অংশ নেন।

ভোটের মাত্রাছাড়া খরচ জোগাচ্ছেন কারা

একের পাতার পর

অর্থাৎ জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় তৈরি সরকারি কোষাগারই গণতন্ত্রের মহোৎসবের ভিত্তি। ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনের মোট খরচ হয়েছিল ১০০০ কোটি টাকার কিছু বেশি। ২০২৪ লোকসভার নির্বাচনে এ রাজ্যে খরচ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৬০০ কোটি টাকা। এ বারের বিধানসভা নির্বাচনের খরচ নির্বাচন কমিশন ধার্য করেছে দু'হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ নির্বাচনের খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৫ শতাংশ। আশঙ্কা শেষ পর্যন্ত তা আরও বাড়তে পারে। নির্বাচন কমিশনই এসআইআর প্রক্রিয়ায় মোট খরচ ধার্য করেছিল সাড়ে চারশো কোটি টাকা, যা ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার কিছু সাধারণ খরচ যেমন ল্যাপটপ ভাড়া নেওয়া, অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার পাশাপাশি এই প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত ২৬ জন রোল অবজারভার, আট হাজার মাইক্রো অবজারভার, ৭০০ জন বিচারপতির জন্য মোটা অঙ্কের সাম্মানিক, তাঁদের বিলাসবহুল থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করতেই খরচের বহর আরও বাড়ছে। এঁদের জন্য এর বাইরেও যে সব খাতে খরচ বাড়ছে জানলে ভিরমি খেতে হয়।

কোনও কোনও পর্যবেক্ষক নিজেদের জুতো পালিশ থেকে হজমিগুলি, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রতম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্যও বিল ধরিয়ে দিচ্ছেন। এমনকি নিজের চেম্বারে ছোট ফ্রিজ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার এসেছে। তাই খরচের শেষ অংকটা কোথায় গিয়ে যে থামবে তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সরকারি তহবিল থেকে দেদার অর্থ খরচ করে যাচ্ছেন যাঁরা, তাঁরা একবারও ভাবছেন না, যে মানুষ এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিচারাধীন তালিকায় চলে গেলেন, যাঁর ভোটাধিকার শেষ পর্যন্ত থাকবে কি না এ প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হল না, যাঁরা এই প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হলেন, প্রাণ হারালেন, হয়ত যাঁদের ভোটাধিকার শেষ পর্যন্ত থাকবেও না, তাঁদেরও কষ্টার্জিত অর্থ এসআইআর এবং নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়েছে। তা এ ভাবে খরচ করা চলে না।

এমন বিপুল ব্যয়ে যে নির্বাচন-মহোৎসব সংগঠিত হচ্ছে জনসাধারণের জীবনের বাস্তব সমস্যাগুলির উপর তা কি কোনও প্রভাব ফেলছে? মানুষের জীবন-যাপনের কিছুমাত্র উন্নতি ঘটেছে না কি এক একটি নির্বাচন গেলে তা আরও দুর্বিষহ হচ্ছে? নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে সরকারগুলি দরাজহস্ত, তারাই জনসাধারণের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর ক্ষেত্রে বজ্রমুষ্টি। শিক্ষাখাতে স্বাস্থ্যখাতে কৃষিক্ষেত্রে শিল্পস্থাপনে বরাদ্দ বাড়ছে না। ২০২৬-২৭ বর্ষে পেশ করা রাজ্য স্বাস্থ্য বাজেটে জিডিপির মাত্র ৬.৯ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে, যা অন্তত ১০ শতাংশ করা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল এবং ২০১৭ জাতীয় স্বাস্থ্যনীতিতে তার সুপারিশও ছিল।

২০২৬-২৭ এর অন্তর্বর্তী শিক্ষা বাজেটেও উল্লেখযোগ্য কোনও বৃদ্ধি ঘটেনি, যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। রাজ্যে শিশুমৃত্যুর হার বাড়ছে। মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি, গ্যাসের সংকট এবং দাম বৃদ্ধি, বেকার সমস্যা, শ্রমিক ছাঁটাই— সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যাপক দুর্নীতি সব দিক দিয়ে জনসাধারণের উপর পড়ছে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার বদলের দ্বারা মানুষের দুরবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটছে না। শুধু কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি খয়রাতিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করছে সরকার। জীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ সাধারণ মানুষকে সামান্য কিছু অর্থনৈতিক সহায়তা দিয়ে শুধুমাত্র নির্বাচনের গণ্ডির মধ্যেই তাদের আটকে ফেলার রাজনীতি চলছে। কেবল এ রাজ্যে নয়, মহারাষ্ট্র-মধ্যপ্রদেশ-তামিলনাড়ু-কর্ণাটক-তেলেঙ্গানা ইত্যাদি রাজ্যগুলিতেও নানা নামে একই ধরনের প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

দলের নাম যা-ই হোক, ভোটসর্বস্ব দলগুলি ভোটের দিকে তাকিয়ে কিছু পদক্ষেপ নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা জনজীবনের দুর্দশাকে স্পর্শও করতে পারছে না। এক দিকে জনগণের সমস্ত অধিকার হরণ করা হচ্ছে, অন্য দিকে জনসাধারণ যাতে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে ব্যাপক বিক্ষোভে ফেটে না পড়তে পারে সে কারণে মহা আড়ম্বরে বিপুল ব্যয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে 'গণতন্ত্রের মহোৎসব'। অর্থাৎ ভোটাধিকারকে দেশবাসীর কার্যত একমাত্র অধিকার হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। বাস্তবে মানুষের সমস্ত দুর্দশার মূলে যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটি তাকে না বদলে, শুধু সরকার বদলে মানুষের দুর্দশার বদল ঘটবে না। তাই ভোটে একটি দলের সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভকে প্রশমিত করতে আর একটি দলকে সামনে আনা হচ্ছে। সুদিনের আশায়, পান্তার সাথে সামান্য নুনের বন্দোবস্ত করতে সাধারণ মানুষ প্রতিবার কষ্ট করে হলেও ভোটের লাইনে গিয়ে দাঁড়ান, তাতে কখনও সরকার হয়ত বদলাচ্ছে, মানুষের দুরবস্থার বদল ঘটছে না। নির্বাচনে গণতন্ত্রের ঠাটবাট রক্ষিত হয় ঠিকই, এর বিপুল ব্যয়ভার বহন করেন যে গৌরী সেনরা, তাঁরা সেই অন্ধকারেই থেকে যান।

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে জনসংযোগে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) প্রার্থী কমরেড নিরঞ্জন নস্কর

দপ্তরের তথ্যই মানছেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

একের পাতার পর

করেছিলেন।

বাংলাদেশে তখন আওয়ামি লিগের সরকার। ভারতের বিজেপি সরকারের সাথে তাদের খুবই দোস্তি। তারাও বিজেপি নেতাদের এত বড় মিথ্যা হজম করতে পারেননি। ওই বছরের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বললেন, ভারতে অবৈধ ভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের তালিকা চেয়েছেন তাঁরা। ভারত সরকারের কাছ থেকে এই তালিকা পেলে তাঁরা ফিরিয়ে নেবেন নিজের দেশের নাগরিকদের। (এই সময়, ১৭.১২.২০১৯)

কিন্তু তালিকা কোথায়? তালিকা দেওয়া দূরস্থান, তালিকা প্রস্তুত করার কাজেই হাত দেয়নি ভারত সরকার। বাংলাদেশ সরকারের এই অবস্থানের ফলে ভারতের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক পদস্থ আমলা জানিয়েছিলেন, মুখে বলা আর কাগজে কলমে বাস্তবায়িত করা দুটোর মধ্যে ফারাক অনেক। কেন্দ্রীয় সরকার যদি তালিকা তৈরির কাজে হাত দেয়, তা হলে তালিকা তৈরির পর সেই তালিকায় থাকা প্রত্যেক ব্যক্তি যে বাংলাদেশি নাগরিক তা প্রমাণ করার দায়িত্বও বর্তায় সরকারের কাঁধে। —কাজটা খুবই কঠিন (ওই)। অর্থাৎ, তথ্য নেই, প্রমাণ নেই, কোনও উপযুক্ত তালিকা নেই, শুধু আছে মিথ্যা ভাষণের সদম্ভ হুঙ্কার। এ হল হিটলারি ফ্যাসিস্ট রাজনীতির ঘৃণ্য উদাহরণ। আবার অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে একেবারে যে কোনও তথ্য নেই, তা নয়। কিন্তু সেই তথ্য ওরা গোপন করতে চায়, গোপন রাখতে চায়।

২০২৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর লোকসভায় একটা প্রশ্ন রেখেছিলেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া ও শর্মিলা সরকার। প্রশ্নটা ছিল, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এই পর্যন্ত কত অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটেছে এবং সেই ঘটনায় কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? উত্তরে অমিত শাহের স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, ২০২১ সাল থেকে ২০২৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশের ঘটনা ও সেই সব ঘটনায় গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল যথাক্রমে এই রকম—

সাল	অনুপ্রবেশের ঘটনা	গ্রেফতার
২০২১	৭০৩	১২০৮
২০২২ সাল	৮৫৭	২০৭৬
২০২৩ সাল	৭৪৬	২৬১৭
২০২৪ সাল	৯৭৭	২৫২৫
২০২৫ সাল (নভেম্বর)	১১০৪	২৫৫৬

তথ্যে দেখা যাচ্ছে অনুপ্রবেশের সংখ্যাটা উল্লেখযোগ্য নয়। বলতে গেলে অতি নগণ্য। আর এই যারা ঢুকছে তারা সবাই বাংলায় ঢুকছে তাও নয়, বিজেপি শাসিত ত্রিপুরা, আসাম ইত্যাদি রাজ্যেও ঢুকছে। এই সরকারি পরিসংখ্যান তো বিরোধীদের তৈরি নয়— এ তো খোদ অমিত শাহের দপ্তরের হিসাব। এই হিসাবকেই তো তাঁর গ্রহণ করা উচিত। তা না করে ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলেছেন কেন? বাংলার মানুষকে এই সত্যটা বলতে তিনি ভয় পাচ্ছেন কেন? তা হলে তিনি বলুন, নিজের দপ্তরের দেওয়া পরিসংখ্যানের উপর তাঁর কোনও আস্থা নেই। অর্থাৎ ১২ বছর ধরে তাঁর পরিচালনাধীন স্বরাষ্ট্র দপ্তর অযোগ্য। এর উদ্দেশ্য একটাই হতে পারে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভোট হাসিল করা।

বাংলায় ভোট চাইতে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতি-অপশাসনের বিরুদ্ধে তাঁরা বলতে গেলেই মানুষ বলছে— ১৫টা রাজ্যে তোমরা আলাদা কী করেছ বলো! কিছু বলার নেই বলেই এখন অনুপ্রবেশকারীর ভূত দেখিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি ছাড়া তাঁদের করার কিছু নেই। কিন্তু একটা কথা তিনি ভুলে গেছেন। মানুষকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ভুল বোঝানো যায় না। তাঁরা সত্য ধরতে পারবেই এবং তারপর অমিত শাহজিদের মতো ফ্যাসিস্টদের কাছ থেকে জবাবদিহি চাইবেই।

অমিত শাহজি ঘুসপেটিয়া বলে যতই চিৎকার করবেন, ততই তিনি প্রমাণ করবেন— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো দায়িত্বশীল পদের তিনি যোগ্য নন। আর, এক অযোগ্য ব্যক্তির মুখের কথা মানুষ বিশ্বাস করবেন কেন?

শ্রমিক ছাঁটাইয়ের দায় যন্ত্রের থেকেও বেশি মুনাফালোভী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার

২০ বছর চাকরি-জীবন কাটানোর পর কাউকে যদি ‘বেকার’ ঘোষণা করা হয়, তার অনুভূতিটা ঠিক কী রকম হবে? বছরের পর বছর দক্ষতার সাথে চাকরি করে স্বচ্ছন্দে সংসার প্রতিপালন করে যে কর্মীটি হঠাৎ একটি ই-মেলে জানতে পারলেন, তার কাজটি আর নেই, পরের দিন থেকে তাকে আর চাকরি ক্ষেত্রে যেতে হবে না, দুঃখে-আত্মগ্লানিতে সে যদি পাগল হয়ে যায়, সে যদি আত্মহত্যা করে বসে, তখন সংবাদপত্রের এক কোণে হয়তো সেই খবর জায়গা পাবে। ভোটের বাজারে তাঁর প্রতি সহানুভূতি দেখানোর প্রতিযোগিতাও চলবে হয়ত শাসক দলগুলির মধ্যে। কিন্তু বাস্তবেই এরকম অসংখ্য ছাঁটাইয়ের ঘটনা আজ বহু সংসারকে ছারখার করে দিচ্ছে। ছারখার করে দিচ্ছে সন্তানকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে বড় করে তোলার স্বপ্ন, চিকিৎসার খরচ জুগিয়ে বাবা-মাকে একটু স্বস্তিকে রাখতে পারার স্বপ্ন।

‘২০ বছরের বেশি চাকরি করার পর ১ এপ্রিল ভোরে ই-মেলে জানতে পারলাম, আমার চাকরি নেই’। বলেছেন সদ্য চাকরি হারানো মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা ওরাকলের এক ভারতীয় কর্মী। এমন অসংখ্য কর্মী নতুন অর্থ বছরের শুরুতেই হৃদয়বিদারক এই খবরটি জানতে পেরেছেন। কোম্পানির কোনও আগাম ঘোষণা ছিল না, দেওয়া হয়নি কোনও নোটিসও। একটা মাউসের ক্লিকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এই তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার কয়েক হাজার কর্মীর চাকরি চলে গেল। কর্মীরা হতভম্ব হয়ে হঠাৎই জানতে পারলেন যে তাঁদের চাকরি আর নেই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য পরিকাঠামো এবং ডেটা সেন্টারে বিনিয়োগের কারণে খরচ কমাতে সংস্থার কিছু পদ লোপ করতে হচ্ছে বলে কোম্পানি কর্তাদের দাবি। গণহারে এই ছাঁটাইকে তারা সংস্কারের ‘এক ধাপ অগ্রগতি’ হিসাবেই দেখিয়েছেন। কিন্তু সংস্থার অগ্রগতি যে কর্মচারীদের জীবনে অন্ধকার নামিয়ে আনছে, তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু একটি পরিসংখ্যানেই। ২০২৫-এর মে মাসে ওরাকলের আয় ছিল ১২.৪৪৩ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১ লক্ষ ২৪ হাজার কোটি টাকা, আগের বছরের থেকে ১৮.৮৮ শতাংশ বেশি, সেই অতি লাভজনক সংস্থা এক লহমায় অসংখ্য কর্মীর ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিল। বিশ্বজুড়ে এই সংস্থা মোট ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছে, এর মধ্যে ১২ হাজারই ভারতের। ছাঁটাইয়ের আশঙ্কায় দিন গুনছেন আরও বহু কর্মী।

ওরাকলের মতো বহু সংস্থাই ছাঁটাই করছে কর্মীদের। ২০২৫ সালে ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টিসিএস ঠিক এ ভাবেই ১২ হাজার কর্মী ছাঁটাই করেছিল। মার্কিন বহুজাতিক অ্যামাজন ছাঁটাই করেছিল ১০ হাজারের বেশি কর্মী। নীতি আয়োগের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩ থেকে ২০৩১-এর মধ্যে ভারতে তথ্যপ্রযুক্তিতে ২০ লক্ষ লোক কাজ হারাবে। ২০২৬ সালেই শুধু ৬৫ হাজার কর্মী ছাঁটাই হবে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে। ২০২৫-এর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে প্রায় ১.১৭ মিলিয়ন চাকরি বাতিল হয়েছে, যা ২০২০-র করোনা অতিমারির ২.২ মিলিয়নের পর সর্বোচ্চ। (দ্য ওয়াল-৬ ডিসেম্বর,২০২৫) ‘সাইলেন্ট লে অফ’ বা স্বেচ্ছাকৃত পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে কর্মীদের। বেসরকারি ক্ষেত্র তো বটেই, সরকারি ক্ষেত্রেও কাজের নিরাপত্তা নেই। কারণ হিসাবে এ আই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কথা এবং অটোমেশনের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু সেটাই কি কারণ?

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় মুনাফাই যেহেতু একমাত্র লক্ষ্য, তাই প্রযুক্তির উন্নতি শ্রমিক-কর্মচারীদের জীবনমানের কোনও উন্নয়ন ঘটায় না। বরং তা শোষণকে আরও তীব্র করে। উল্টে মালিক প্রযুক্তি ব্যবহারের নামে শ্রমিক ছাঁটাই করে ইচ্ছামতো। শ্রমিক-কর্মচারীদের উপর কাজের অতিরিক্ত বোঝা চাপায়। এ আই-ও তাই দক্ষ শ্রমিকদের জীবনে সুরাহা আনার বদলে তাদের ছেঁটে ফেলছে।

তাই আজ যে শ্রমিক-কর্মচারী তাঁর দক্ষতার জন্য মালিকের কাছে অপরিহার্য, তিনিই আগামীকাল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের পর বাতিল হয়ে যাবেন। তা হলে প্রযুক্তিই কি সর্বনাশা? না। যত দিন না উৎপাদনের উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে গোটা সমাজের তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থে পরিচালিত হচ্ছে, তত দিন প্রযুক্তিও মালিকের স্বার্থই রক্ষা করবে। শ্রমিকদের শ্রম লাঘব বা তাদের কাজে সাহায্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না। ফলে ছাঁটাইয়ের সংকট বাড়তেই থাকবে। তাই দরকার উৎপাদনের উদ্দেশ্যের দ্রুত বদল।

জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণায় দলের ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার শ্যামনগর লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড শঙ্কর পাত্র ২৮ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

কাঁচরাপাড়ার এক নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের বড় ছেলে ছিলেন কমরেড শঙ্কর পাত্র। ১৯৬৬-তে ইছাপুরে অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরিতে অ্যাপ্রেন্টিস ট্রেনিঙের সময় জয়নগরের কমরেড ভবানী শঙ্কর ঘোষের সাথে তাঁর পরিচয় হয়। পরে তাঁরা দু-জনেই মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে একই কারখানায় চাকরি পেলে কমরেড শঙ্কর পাত্র ধীরে ধীরে পার্টির চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত হন। দু-জনে মিলে জব্বলপুরে পার্টি ইউনিট গঠন করার ব্যাপারে চিন্তা করতে থাকেন। বিভিন্ন অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরির কিছু যোগাযোগকে নিয়ে স্টাডি সার্কেল তৈরি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটকের দল তৈরি সহ নানা ধরনের কাজ শুরু হয়। ১৯৭৩-এ কমরেড শঙ্কর পাত্র সহ এই যোগাযোগদের মধ্যে কয়েকজন কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষাশিবিরে গিয়েছিলেন। এরপর থেকেই শুরু হয় কমরেড শঙ্কর পাত্রের রাজনৈতিক জীবন ও পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রাম।

শরৎচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৭৬-এ জব্বলপুরে নানা কর্মসূচি হয়। তার মাধ্যমে অনেকেই দলে যুক্ত হন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পরবর্তীকালে পার্টি ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করা কমরেড উমাপদ বিশ্বাস। ১৯৮০-তে কমরেড উমাপদ বিশ্বাসকে ইনচার্জ করে জব্বলপুরে দলের জেলা কমিটি তৈরি হয়। কমরেড ভবানীশঙ্কর ঘোষ ও কমরেড শঙ্কর পাত্র সপরিবারে একই বাড়িতে দুটি ঘরে থাকা শুরু করলে সেখানেই সেন্টার গঠনের পরিকল্পনা হয়। এই ঘরেই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতারা সহ অন্য কমরেডরা এলে থাকতেন। সব মিলিয়ে এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি হয়। ১৯৮৮-তে পার্টির প্রথম কংগ্রেসের আগে কমরেড শঙ্কর পাত্র জব্বলপুর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। চাকরি থেকে অবসরের পর শ্যামনগরে ফিরে এসেও তিনি দলের কাজ করেছেন।

তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা এসেছে, কিন্তু পার্টির কাজকর্মে তার প্রভাব পড়েনি। সারা জীবন আদর্শের প্রতি অবিচল থেকে হাসিমুখে পার্টির কাজ করে গেছেন। স্ত্রী-সন্তানকে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। সন্তান পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবে— এ ছিল তাঁর আন্তরিক বাসনা। দল ছিল তাঁর অভিভাবকের মতো। পার্টি কমরেডদের, বিশেষত জুনিয়র কমরেডদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। শিশুদের সাথে অত্যন্ত সহজে মিশে যেতে পারতেন। তাঁর সূক্ষ্ম রসবোধ সকলকে আনন্দ দিত।

৩ এপ্রিল শ্যামনগর ভারতচন্দ্র পাঠগার হলে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোপাল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড প্রদীপ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত এবং দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃবৃন্দ।

কমরেড শঙ্কর পাত্র লাল সেলাম

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি আন্তর্জাতিক মহলে দেশকে হাস্যাস্পদ করবে

অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান উজ্জয়িনীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং ‘গ্রিনিচ গড় সময়’ বা জিএমটি-র বদলে ‘মহাকাল মানক সময়’ বা এমএসটি চালু করা প্রসঙ্গে যে অবৈজ্ঞানিক মন্তব্য করেছেন তার বিরোধিতা করে ৪ এপ্রিল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি (এআইএসইসি)-র সাধারণ সম্পাদক ডঃ তরুণকান্তি নস্কর এক বিবৃতিতে বলেন,

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি দাবি করেছেন, উজ্জয়িনী হল বিষুবরেখা ও কর্কটক্রান্তি রেখার সংযোগস্থল। তাঁর এই দাবি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং মৌলিক বিজ্ঞানের প্রতি বিস্ময়কর অবজ্ঞার প্রকাশ। জ্যামিতিক ও ভৌগোলিক ভাবে এই বক্তব্য একেবারেই অসম্ভব। বিষুবরেখা (০° অক্ষাংশ) এবং কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° অক্ষাংশ) পৃথিবীপৃষ্ঠে পূর্ব-পশ্চিমে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে। এই দুই রেখা সমান্তরাল হওয়ায় এরা কখনও একে অপরকে ছেদ করতে পারে না। তা ছাড়া, কর্কটক্রান্তি রেখার অবস্থান মধ্য ভারতে এবং বিষুবরেখার অবস্থান সম্পূর্ণ ভাবে দক্ষিণ ভারতে। জনসমক্ষে মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল জ্ঞানকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এ ভাবে উপেক্ষা করা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমরা সকলেই জানি, বিশ্বব্যাপী সময়মান নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা যখন হয়নি, সেই সময়ে গোটা বিশ্ব জুড়েই প্রাচীন সভ্যতাগুলির, সাংস্কৃতিক দিক থেকে তাদের নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ শহরের ভিত্তিতে নিজস্ব স্থানীয় ‘মূল মধ্যরেখা’ বা প্রাইম মেরিডিয়ান নির্ধারণ করা ছিল প্রচলিত রীতি। গ্রিকরা আলেকজান্দ্রিয়া শহরকে, ইসলামি পণ্ডিতরা বাগদাদ শহরকে এবং ফরাসিরা প্যারিস শহরকে এই কাজে ব্যবহার করত। যুক্তির সেই ঐতিহ্যের ধারায় সূর্যসিদ্ধান্তের মতো প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে উজ্জয়িনীকে ভারতীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় মূল মধ্যরেখা হিসাবে বিবেচনা করা হত। যাই হোক, প্রাচীন জ্যোতির্বিজ্ঞানের সেই সমৃদ্ধ ও স্থানীয় ইতিহাসকে মান্যতা দেওয়া, আর আজকের দিনে সেই যুক্তির খাতিরে পরিষ্কার ভাবে ভ্রান্ত ভৌগোলিক তত্ত্বকে সঠিক বলে দাবি করা— দুটো সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়।

আসল কথা হল, যেহেতু পৃথিবী জুড়ে আলাদা আলাদা দ্রাঘিমাংশ যুক্ত স্থানগুলিতে সময়ও বিভিন্ন, সেই কারণে একটি নির্দিষ্ট দ্রাঘিমারেখাকে ভিত্তি হিসাবে ধরে তার সাপেক্ষে অন্য সমস্ত স্থানের সময় নির্ধারণ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে যে কোনও একটি রেখা বেছে নেওয়া যেতে পারে এবং এই রেখার কোনও বিশেষ বৈশিষ্ট্য নেই। ঐতিহাসিক ভাবে গ্রিনিচের দ্রাঘিমাংশকে আন্তর্জাতিক ভাবে সেই রেখা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ফলে, এটা স্পষ্ট যে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর একমাত্র লক্ষ্য, কোনও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি ছাড়াই জিএমটি-র জায়গায় ‘মহাকাল মানক সময়’ চালু করার জন্য উজ্জয়িনীর ভৌগোলিক অবস্থানকে মহিমান্বিত করা এবং এর দ্বারা আন্তর্জাতিক মহলের সামনে আমাদের দেশকে হাস্যাস্পদ করা। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনার আমরা বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে তাঁর বিবৃতির প্রত্যাহার দাবি করছি।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 78, No.: 36 Bengali Weekly April 17, 2026 Kolkata Price: Rs. 3.00

কর্ণাটকে সরকারি স্কুল বন্ধের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিড ডে মিল কর্মীদের

কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকার রাজ্য জুড়ে সরকারি স্কুলগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে কাজ হারাচ্ছেন মিড ডে মিল কর্মীরা। প্রতিবাদে ১০ এপ্রিল এআইইউটিইউসি-র নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিড ডে মিল কর্মীদের

জাতীয় শিক্ষানীতির বিকল্প

জনগণের শিক্ষানীতি নিয়ে গোল টেবিল বৈঠক

পাতিয়ালায় পাঞ্জাবি ইউনিভার্সিটিতে বক্তব্য রাখছেন অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক তরুণ নস্কর। ৮ এপ্রিল

সামার স্পেশাল ট্রেনকে স্থায়ী করার দাবি

স্মারকলিপি

ডিআরএম-দফতরে

দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৬ এপ্রিল থেকে হলদিয়া-হাওড়া, দিঘা-হাওড়া লাইনে দুই জোড়া সামার স্পেশাল ট্রেন চালু হয়েছে। এই ট্রেনগুলিকে স্থায়ীভাবে চালানো ও ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানোর দাবিতে খড়গপুর ডিভিশনের ডিআরএম-এর কাছে ৭ এপ্রিল স্মারকলিপি দেন নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের সদস্যরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের আহ্বায়ক মধুসূদন বেরা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে এই দুই লাইনে কমপক্ষে চার জোড়া ট্রেন চালুর দাবি জানিয়ে আসছি আমরা। কিন্তু কর্তৃপক্ষ মাত্র দু'জোড়া ট্রেন চালু করেছে, তা-ও আবার শুধু গ্রীষ্মকালের জন্য।

স্মারকলিপিতে অভিযোগ জানানো হয়েছে, কিছু লোকাল ট্রেনকে এক্সপ্রেস ট্রেনের তকমা দিয়ে যে দ্বিগুণ ভাড়া নেওয়া হচ্ছে, অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়াও মেছেদাতে ওভারব্রিজের বিপরীত দিকে একটি এস্কেলেটর এবং পাঁশকুড়া-তমলুকে রেলক্রসিং-এর উপরে ফ্লাইওভার ও ভোগপুরে আন্ডারপাস নির্মাণ করার দাবিও জানানো হয়।

আন্দোলনের চাপে ওড়িশায় কৃষক নেতাদের মুক্তি

ওড়িশার কেওনঝড় জেলার পাটানা ব্লকের যমুনাপোশী গ্রামের উর্বর বহুফসলি জমিতে মেগাস্টিল প্ল্যান্ট তৈরির জন্য জিন্দাল গোষ্ঠী ও পস্কো কোম্পানির সঙ্গে সরকারের চুক্তি বাতিলের দাবিতে কৃষকরা ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

পুলিশ আন্দোলনের অন্যতম নেতা প্রকাশ মল্লিক সহ কৃষক নেতাদের ৩১ মার্চ গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে এবং বহু কৃষকের নামে মিথ্যা মামলা দায়ের করে। তাঁদের মুক্তির দাবিতে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের চাপে সরকার ১১ এপ্রিল তাঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়।

ঘাটশিলায় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির

২-৪ এপ্রিল এআইডিএসও বিহার রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে একটি শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৭টি জেলা থেকে ৩০০ জন প্রতিনিধি নানা বিষয়ে আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক বক্তব্য রাখেন। সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি সৌরভ ঘোষ ভারতীয় নবজাগরণ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মনীষীদের জীবন-সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়ে শিক্ষার অধিকার রক্ষা এবং সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের কাছে আহ্বান জানান। সমাপ্তি অধিবেশনে কমরেড প্রভাস ঘোষের 'ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কি' বইটির ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন আলোচনা করেন দলের বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণ সিং। শিবিরে অন্যান্য ছাত্রনেতারাও বক্তব্য রাখেন।

রাজ্য জুড়ে এসইউসিআই(সি)-র নির্বাচনী প্রচার

বাঁকুড়ার সোনামুখীতে দলের প্রচার

কলকাতার রাসবিহারীতে দেওয়াল লিখন

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে দেওয়াল লিখন

রঘুনাথপুরে প্রার্থীর সমর্থনে মুটে-মজুরদের মধ্যে প্রচার

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com